### নব প্রার্থনা

বাক্-স্বাধীনতা রক্ষিত হোক। গণতান্ত্রিক পরিসরে আমরা যেন চর্চা করতে পারি প্রেম ও সমানুভূতির। নতুন বছরের কাছে এই তো আকাজ্ফা।

'লিভিং, অফকোর্স, ইজ র্যাদার দ্য অপোজিট অফ এক্সপ্রেসিং।' অনুবাদের নির্যাসে বলতে পারি, বেঁচে থাকাই ভাবপ্রকাশের অভিব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখে। নতুন একটি বছর শুরু করার সময় আমরা অতএব কী প্রত্যাশা করছি? কেমন করে আমরা এই সূচনাবিন্দুকে দেখতে চাইব? কী প্রার্থনা করব ? কোন শুভাকাঞ্জ্ঞার কেমন উড়াল দেব ? নীরবতায়, অ-বাষ্ময় রাগে, মনের সজলতা ও চলাচল হারিয়ে কেবল দৃশ্যের জন্ম দেখে যাব ? না, বেঁচে থাকার জীবনধর্মও

সামাজিক যে-উৎকণ্ঠা এই নতুন বছর আরম্ভের মুহূর্তে নাছোড় সঙ্গী হতে চলেছে বলে আমাদের আশঙ্কা, তা হল,

বাক্-স্বাধীনতার স্ফূর্তি-লোপ। কোদালকে কোদাল বলার জন্য বেশি কসরত করার দরকার হয় না। তবে সবসময় তা সমান শ্রুতিমধুর না-ও ঠেকতে পারে। এখানেই গণতান্ত্রিক পরিসরের তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা, চর্চা জারি রাখলে হয়তো-বা সার্থকতাও। প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি সত্যর অনুচ্চারণে বিশ্বাসী। অর্ধসত্যের প্রচারে আস্থাবান। আর, গণতান্ত্রিক পরিসর প্রতিষ্ঠানের পছন্দের বাইরে গিয়ে সত্য পরিবেশনের সুযোগ করে দেয়। সম্যক আলোচনার জমি প্রস্তুত করে। অপ্রিয় ও অন্তরালে থাকা মতামত যাতে সামনে তুলে আনা যায়— সে-বিষয়ে যত্নবান হয়। ভারতের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি আশায় আমাদের বুক বাঁধতে প্রবুদ্ধ করে ? দলীয় ভাবাদর্শ যেভাবে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সামনে অন্তরায় হয়ে উঠছে, তা সময়-বিশেষে ভীতির উদ্রেক ঘটায়। অ-সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ ক্রমশ অস্বচ্ছ হয়ে উঠছে। ধর্মীয় উগ্রতা বাড়ছে। জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই। কিন্তু,

এই কথা ক'জন আর বিশ্বাস করে? প্রেম ও

সমানুভূতি হারানোর দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হচ্ছে

রাজনৈতিক আখ্যানের মাধ্যমে। অল্প তথ্য,

আধভাঙা তত্ত্ব এবং অনেকখানি প্ররোচনার

সমবায়ে নির্মিত হচ্ছে যে উদ্দেশ্যকামী রাজনৈতিক ন্যারেটিভ, তা জনগণের মন ও হৃদয় জয় করতে কত দূর সমর্থ হবে, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। অলীক কুনাট্য রঙ্গের পুনরাবর্তনে কোথাও কি চোখের পাতার উপর মেদের মতো ভারী হয়ে ওঠেনি ক্লান্তি? সুবিচার এবং সততার মধ্যে কি স্থায়ী হয়নি দুর্ভেদ্য কুয়াশার দূরত্ব? স্বাধীনতার ৭৬ বছরের বেশি সময় অতিক্রম করার অবকাশে আমরা কিছুই অর্জন করিনি, এমন বললে সত্য-গোপনের দায় নিতে হয়। কিন্ত এ-ও তো অস্বীকারের সুযোগ নেই যে, মঙ্গলকামী রাষ্ট্রের মখচ্ছবি এখনও দেশের অনেকানেক নাগরিকের কাছেই অধরা। বেকারত্ব, দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতের কামড় টের পাওয়া যায় বইকি। অবাধ এবং রুচিশীল, যুক্তিময় ও অনুশাসনপূর্ণ বাক্-স্বাধীনতা পারে এসবের বিরুদ্ধে সরব হতে— প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্নের মন্থন পেরিয়ে গণতান্ত্রিক পরিসরে

আলোচনাকে প্রসারিত করে তুলতে। পারে বেঁচে থাকার সগর্ব উপস্থিতির পাশে অপরিহার্য অভিব্যক্তির সুচারু মেলবন্ধন ঘটাতে। নতুন বছর পারবে আমাদের এই উদার আকাশ দিতে?

আসল নাম

শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঘড়ি-সহ মিনারটিকে অনেকেই 'বিগ বেন' নামে চেনেন, কিন্তু এর 'এলিজাবেথ টাওয়ার', আগে যা ছিল 'ক্লক টাওয়ার'। আসলে টাওয়ারের মধ্যিখানে অবস্থিত বড় ঘড়িটির নাম 'বিগ বেন' বা বড় ঘড়ি।



১৮৭৪ ফেনউইক্স বাজার ভেঙে নতুন রূপে জনগণের জন্য উন্মুক্ত হয় কলকাতার তৎকালীন চেয়ারম্যান স্টুয়ার্ট হগ-এর নামে হগ মার্কেট, যা 'নিউ মার্কেট' নামে পরিচিত। ১৮৭১ সালে পাস হয় 'দ্য কলকাতা মার্কেটস অ্যাক্ট-৮' এবং স্থপতি রিচার্ড রোসকেল বেইন এবং নির্মাণ সংস্থা বার্ন অ্যান্ড কোং-এর তত্ত্বাবধানে এই বাজারের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৮৭৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে।

#### উত্তর সম্পাদকীয়

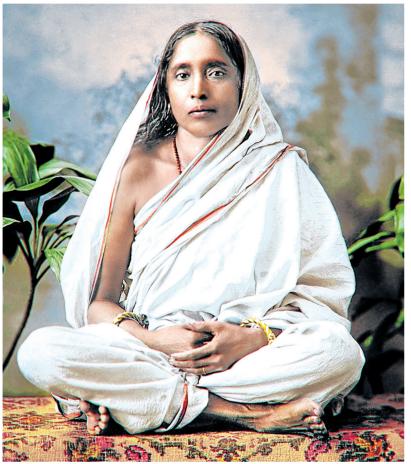
দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

অফুরস্ত ভোগ-বাসনার তাৎক্ষণিক পরিতৃপ্তির এই যুগেও সুখ নেই। 'শুধু সুখ চলে যায়।/ এমনি মায়ার ছলনা।' সুখের আশায় সংসারে মানুষের 'যাতায়াত ফুরায় না'। শ্রীমা সারদা দেবী বলেছেন, 'একটু সন্দেশ খাবার বাসনা থাকলেও পুনর্জন্ম হয়।' তাই 'নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়।' চাওয়ার তো কোনও শেষ নেই! আধুনিক যুগের সীমাহীন লোভ ও চাহিদার প্রেক্ষিতে সারদা দেবীর এই কথাটির তাৎপর্য গভীর এবং প্রাসঙ্গিক। বাসনায় আগুন জ্বেলে দিতে বলেছিলেন সাধক রামপ্রসাদও— 'বাসনায় দে আগুন জ্বেলে ক্ষার হবে তায় পরিপাটি।' এই ক্ষার-ই হল মনের কালি ঘুচিয়ে দেওয়া। আর. সেই অজ্ঞানতার আবরণ সরে গেলেই তো আসল জ্ঞান। সারদা দেবী বলছেন, 'জ্ঞান হলে মানুষ দেখে ঠাকুর-ঠুকুর সবই মায়া।' অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে সবই তো তখন এক। ভোগের নেশা আর মুহূর্তের আহ্লাদের ঘোর কাটাতে আধ্যাত্মিক জীবনচর্যার গুরুত্বের কথা সেই কবেই শুনিয়েছিলেন জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার। উপনিষদ যাঁর জীবনে এনে দিয়েছিল অপার শান্তি সেই উপলব্ধির ভিত্তিতেই 'দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ উইল' বইয়ে তিনিও বলেছিলেন কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত

প্রযুক্তির উত্তুঙ্গ শিখরস্পর্শী আমেরিকা। কৃত্রিম মেধা আর ভার্চুয়াল রিয়ালিটির আবহে নবতম গবেষণার ফসল 'নিউরালিক্ক' (Neuralink)— চেতনা আর কম্পিউটিংয়ের মাঝের ভেদরেখাটি মুছে ফেলার উচ্চাকাঞ্জ্মী অভিলাষ ইলন মাস্কের। ইন্টারনেট, ইউটিউব, থ্রি-ডি প্রিন্টিংয়ের দুনিয়ায় যাবতীয় সৃষ্টিকে খুশিমতো নিয়ন্ত্রণ করার বাসনায় মাতোয়ারা মানুষ। তবু উন্নত দেশের আধুনিক সমাজ প্রাচুর্য আর ক্ষমতা মুঠোয় ভরেও সুখী হতে পারছে না। মনস্তত্ত্বের মার্কিন অধ্যাপক ডেভিড মায়ার্স তাঁর 'দ্য আমেরিকান প্যারাডক্স' বইয়ে লিখছেন, 'ইন অ্যান এজ অফ প্লেন্টি, উই ফিল স্পিরিচুয়াল হাঙ্গার'— প্রাচুর্যের মধ্যেও আমেরিকার মানুষের অন্তরে অধ্যাত্ম-তৃষ্ণ। ২০২৩ সালের 'দ্য স্টেট অফ মেন্টাল হেলথ ইন আমেরিকা' রিপোর্টে বেশ কিছু আশঙ্কাজনক বিষয় উঠে এসেছে। সে-দেশের ২১ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ বা ৫ কোটি মার্কিন নাগরিক মনোরোগের শিকার। সবকিছু পেয়েও মানসিক অবসাদ এতটাই বেশি যে প্রতি একশো জনের মধ্যে গড়ে প্রায় জনা পাঁচেক আত্মহত্যা-প্রবণ। বিশিষ্ট মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ জিন টোয়েং গবেষণায় দেখছেন, বযঃসন্ধিকালীন মার্কিন কিশোর-কিশোরী— ইন্টারনেট জমানার যারা প্রথম প্রজন্ম— সেই 'জেনারেশন আই'-এর মুখে হাসি নেই। কারণটা হল, স্মার্টফোন, সোশ্যাল মিডিয়া ও অন্যান্য প্রযুক্তিতে এই প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের প্রবল

# বাসনার ক্ষয়, সুখের সন্ধান

প্রযুক্তির যত উন্নতি হচ্ছে, মানুষ ততই হয়ে পড়ছে নিঃসঙ্গ। ইন্দ্রিয়-সুখ আর ভোগের সামগ্রীতে বুঁদ হয়ে থাকলেও ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত এক শূন্যতা-বোধ কুরে কুরে খাচ্ছে প্রত্যেককে। পথ দেখাবে নির্বাসনা? ৩ জানুয়ারি শ্রীমা সারদা দেবীর জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ।



আসক্তি। তবে শুধু আমেরিকা নয়, এমন প্রবণতা বিশ্ব জুড়ে ক্রমবর্ধমান। প্রযুক্তির যত উন্নতি হচ্ছে, মানুষ ততই হয়ে পড়ছে নিঃসঙ্গ। ইন্দ্রিয়-সুখ আর ভোগের সামগ্রীতে বুঁদ হয়ে থাকলেও ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত এক শূন্যতা-বোধ কুরে কুরে খাচ্ছে প্রত্যেককে।

তাৎক্ষণিক পরিতৃপ্তির এই আনন্দ-বিষাদের বৈপরীত্য নিরসনে ইদানীং পজিটিভ সাইকোলজির চর্চা আদতে মনে করিয়ে দেয় বেদান্ত দর্শনের কালজয়ী শিক্ষাকে। ১৯৭২ সালে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়াল্টার মিশেল ৫-৬ বছরের প্রি-স্কুলার বাচ্চাদের নিয়ে করেছিলেন 'মার্শম্যালো টেস্ট'। একটি শিশুকে একটি মার্শম্যালো বা ক্যান্ডি দিয়ে বলা হয়, তোমার সামনে পছন্দ দু'টি। হয় তুমি এখনই এটা খেয়ে ফেলতে পারো, অথবা তুমি যদি ধৈর্য ধরে থাকো, তাহলে

শেষকথা নয়।

পনেরো মিনিট পরে আমি এসে তোমাকে একটা নয়, আরও দুটো মার্শম্যালো দেব।

অধ্যাপক ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরায় রেকর্ড করা হয় তারা কী করছে। সেই বাচ্চাদের আচরণ চিহ্নিত করে ১৫-২০ বছর বাদে দেখা যায় শিশু বয়সে যারা তখনই ক্যান্ডি না-খেয়ে আরও পুরস্কারের জন্য অপেক্ষা করতে পেরেছিল, তারা জীবনে হতে

'বেদান্ত সোসাইটি অফ সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া'-র দর্শন শাস্ত্রের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো এবং রামকৃষ্ণ সংঘর তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী মেধানন্দ— যিনি 'অয়ন মহারাজ' নামে বিশেষ পরিচিত— তিনি একটি অভিভাষণে বিষয়টিকে খুব আকর্ষণীয়ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। বলছেন, যে কেউ এই পরীক্ষাটা নিজের উপরে করে দেখতে পারে। টেলর সুইফ্ট, অলিভিয়া রডরিগজ বা ড্রেকের লেটেস্ট পপ সং চালিয়ে দিন। সেই মুহূর্তে দুরন্ত বিনোদন। হলিউড ব্লকবাস্টার 'টপ গান ম্যাভেরিক' বা জেমস বন্ড মুভি দেখলেও সেই এক চটজলদি উত্তেজনা। কিন্তু তারপর যখন সব থেমে যায়, তখন কেমন যেন শূন্যতা ও অবসাদ গ্রাস করে। প্রাথমিক মজার ঘোর কেটে গেলেই সব অসার। অন্যদিকে, বার্গম্যানের 'সেভেনথ সিল' বা 'উইন্টার লাইট' বা তারকোভস্কির 'দ্য স্যাক্রিফাইস' দেখলে গভীর অনুভূতি। অথবা একবার শুনে দেখুন এস্তোনিয়ার কম্পোজার আর্ভো পার্টের (Arvo Pärt) 'ক্যান্টুস ইন মেমোরিয়াম বেঞ্জামিন ব্রিটন' (Cantus in Memoriam Benjamin Britten). একইভাবে বলিউডের ফিল্মি গানা বা চটুল হিন্দি ছবির পাশাপাশি কল্পনা করুন হিন্দুস্তানি ক্লাসিকাল মিউজিক, পণ্ডিত যশরাজ বা রামপ্রসাদ শোনার অভিজ্ঞতা। সেগুলি দাবি করে অনেক বেশি মনঃসংযোগ। পরিশেষে তা থেকে যে আনন্দ ও তৃপ্তি নিঃসৃত হয়, সেটিকে মনে হয় ব্যক্তিগত অর্জন। মনে তার স্থায়ী আনন্দের রেশ। আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় বেদান্ত যা বলেছে, এখন বিভিন্ন আধুনিক মার্কিন গবেষণার ফলাফলে তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। 'মার্শম্যালো টেস্ট' বা বিনোদনের অভিজ্ঞতা তারই দৃষ্টান্ত। বিশেষ জোরটা দেওয়া হয়েছে আত্মনিয়ন্ত্রণে। 'শ্রীমন্তগবতগীতা'-র অস্টাদশ অধ্যায়ের ৩৭-৩৯ শ্লোকে তিনরকম আনন্দের চরিত্রের কথা বলা আছে। তাৎক্ষণিক

সুখভোগের পরিণাম সম্পর্কে ৩৮ নম্বর শ্লোকটি সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক— 'বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগাদ যৎ তদ অগ্রেঅমৃতোপমম।/ পরিণামে বিষম ইব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম॥' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াসক্তি থেকে যে আনন্দ তা শুরুতে মধুর হলেও পরিণামে বিষবৎ। 'ভাগবত পুরাণ'-এ যযাতির উপাখ্যান স্মরণ করলে আমরা দেখব, হাজার বছর ধরে যাবতীয় জাগতিক সুখ ভোগ করার শেষে তিনি উপলব্ধি করলেন কামনা দিয়ে কামনার নিবৃত্তি হয় না। 'ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি।/ হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ো এবাভিবর্ধতে॥' আগুনে ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নিশিখা যেমন আরও উজ্জীবিত হয় তেমনই ক্রমাগত ভোগের মাধ্যমে বাসনা কখনও মেটানো যায় না। মহাভারতের 'শান্তিপর্ব'-তেও বলা হয়েছে, 'তৃষ্ণাক্ষয়সুখম' অর্থাৎ বাসনার ক্ষয় হলেই বরং সুখী হওয়া যায়। বাইরে থেকে নয়, নিজের ভিতরেই রয়েছে সুখের চাবিকাঠি। ১৮৯৯ সালের ২ ডিসেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'The secret of life is not enjoyment but education through experience.' ঠিক তারই যেন প্রতিধ্বনি আমরা শুনি 'অথেনটিক হ্যাপিনেস' তত্ত্বের প্রবক্তা মার্কিন মনোবিজ্ঞানী ই. পি. সেলিগম্যানের কথায়। সুখের সন্ধানীদের তিনি পরামর্শ দিচ্ছেন আত্মসচেতন

সারদা দেবী বলছেন, 'জ্ঞান হলে মানুষ দেখে ঠাকুর-ঠুকুর সবই মায়া।' অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে সবই তো তখন এক। ভোগের নেশা আর মুহুর্তের আহ্লাদের ঘোর কাটাতে আধ্যাত্মিক জীবনচর্যার গুরুত্বের কথা সেই কবেই শুনিয়েছিলেন জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার। উপনিষদ যাঁর জীবনে এনে দিয়েছিল অপার শান্তি।

হয়ে উঠে নিজের চরিত্রের দুর্বলতা দূর করতে। এই প্রাচুর্য আর ভোগবাদের পৃথিবীতে আমরা স্মরণ করব রাজা বিক্রমাদিত্যর দাদা সংস্কৃত কবি ও দার্শনিক ভর্তৃহরিকে, যিনি উজ্জ্বয়িনীর রাজকীয় সুখ বিসর্জন দিয়ে এক যোগীর জীবন বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর 'বৈরাগ্য শতকম' সংসার-ত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীদের অন্যতম পাঠ্য। সেই বইয়ের একটি শ্লোকে তিনি লিখছেন: 'স তু ভবতি দরিদ্রো যস্য তৃষ্ণ বিশালা।/ মনসি চ পরিতুষ্টে কোঅর্থবান কো দরিদ্রাঃ।' যার বিরাট কামনা-বাসনা সে-ই হল দরিদ্র, আর মানসিক সম্ভুষ্টি থাকলে ধনী-দরিদ্রে কোন ভেদ নেই।

শ্রীরামকফ ছিলেন আদর্শ সন্ন্যাসী। তিনি টাকা ছুঁতে পারতেন না, ধাতুদ্রব্যের স্পর্শে তাঁর হাত বেঁকে যেত। 'মাটি টাকা, টাকা মাটি' বলতে বলতে টাকা ও টাকার প্রতি আসক্তিকে গঙ্গাজলে বিসর্জন দিলেন। আর, শ্রীমা সারদা দেবী টাকা মাথায় ঠেকাতেন, বলতেন, মা লক্ষ্মী। কিন্তু অর্থের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র বাসনা ছিল না। পল্লীগ্রামে দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে বা দারিদ্রের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েও অর্থ যে যাবতীয় অনর্থের মূল, তা তিনিও বিলক্ষণ জানতেন। তাই এক মাড়োয়ারি ভক্ত যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে টাকা দিতে না-পেরে সারদা দেবীর নামে ওই দশ হাজার টাকা লিখে দিতে চাইলেন, তখনই তিনি বলেন— 'না, টাকা নেওয়া হবে না।' সংসারের সব ঝক্কি সামলেও কীভাবে নিরাসক্ত হয়ে অধ্যাত্মজীবন গঠন করা সম্ভব, তা নিজের জীবনের মাধ্যমেই গৃহীদের সামনে তুলে ধরেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে একবার তিনি বলছেন, 'আমার মনে হয় সর্ব ধর্ম সমন্বয় করতে তিনি আসেননি। তাঁর জীবনের মুখ্য কথা হল ত্যাগ।' শ্রীরামকফকে তাই আমরা দেখি দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা করতে— 'আমি দেহসুখ চাই না মা, আমি লোকমান্য চাই না মা, আমি অষ্টসিদ্ধি চাই না মা, আর তোমার ভূবনমোহিনী

কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণর এই ত্যাগ তো কেবল জাগতিক ভোগ-বাসনা ত্যাগের মধ্যে সীমিত নয়, তা ছিল যাবতীয় সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি। তাই নিজের সাধনার মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন ধর্ম সমন্বয়ের বার্তা— 'যত মত তত পথ'। সারদা দেবী নিছক তাঁর সহধর্মিণী নন, শ্রীরামকৃষ্ণর সঙ্গে তিনি অভেদ। চিন্তায়, বাক্যে, আচরণে সারদা দেবী হয়ে উঠেছিলেন 'তদ্ভাবরঞ্জিতা'। তাই শ্রীরামকৃষ্ণর কথাটা তিনি আরও সহজ করে বুঝিয়ে বললেন— 'সাধুপুরুষেরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক এক জনে এক এক রকমের বোল বলেন। পথ অনেক, সেজন্য তাঁদের সকলের কথাই সত্য। যেমন একটা গাছে সাদা, কালো, লাল নানা রকমের পাখি এসে বসে হরেক রকমের বোল বলছে। শুনতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকলগুলিকে আমরা পাখির বোল বলি— একটাই পাখির বোল আর অন্যগুলো নয় এরূপ বলি না।' কী অপূর্ব এই ব্যাখ্যা!

মায়ায় আমায় মুগ্ধ করো মা।'

চূড়ান্ত অসহিষ্ণুতা, তীব্র সংকীর্ণতা আর আত্মরতি-সর্বস্ব এই যুগে সত্যিকারের সুখ, আনন্দ আর শান্তি লাভ করতে হলে বোধশূন্যভাবে আমাদের প্রাচুর্যের পিছনে ছুটে চলার প্রবণতায় রাশ টানতে হবে। সারদা দেবীর ত্যাগব্রতী জীবনের অনুধ্যান করে আমাদের নির্বাসনা হতে হবে।

> (মতামত নিজস্ব) লেখক প্রাবন্ধিক dipankar.dg62@gmail.com

উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধ পাঠাতে পারেন এই ইমেলে sp4.oped@gmail.com। ইউনিকোডে কম্পোজ করে অনধিক ৮০০ শব্দে পাঠানো বাঞ্ছনীয়। লেখায় নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর থাকা বাধ্যতামলক।

আটে-আড্ডায়

শিল্পী প্রণব রায় স্বীয় উদ্যোগে এক

কয়েকজন মানুষকে যাঁরা তথাকথিত

আঁকাঝোকার সঙ্গে সঙ্গেই দু'দণ্ড বসে

একে অপরের সুখ-দুঃখ, আঁজলা ভরে

আঁকায় থাকা— এটুকুই ছিল আদত

উদ্দেশ্য। আর্ট ও আড্ডাকে বিষয়

জিরিয়ে নেওয়া, ভাগ করে নেওয়া

পরস্পরের মনে তুলে দেওয়া

শান্তিবারি, এবং আড্ডায় থাকা-

শিল্পী নন, তবে অবচেতন সযত্নে

লালন করেন সেই সত্তা।

#### উত্তর সম্পাদকীয় ২

অমিতাভ নাগ

জনপ্রিয় সংস্কৃতির সমালোচনামূলক মূল্যায়নের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী অনুভব করতে পারে— কীভাবে জনপ্রিয় সংস্কৃতির রাজনীতি আকাঙক্ষাকে সংগঠিত করে, কল্পনাকে উদ্দীপিত করে এবং শনাক্তকরণের আকার তৈরি করে।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে— 'A picture is worth a thousand words'. অথচ, সাধারণত, আমাদের দেশের/রাজ্যের স্কুলের পড়াশোনার চিরায়ত চৌহদ্দিতে 'picture' দূরবতী আত্মীয়। তার একমাত্র বন্ধুত্ব 'music' এবং 'physical education'-এর সঙ্গে;তাও মূল নয়, সহ-পাঠ্যক্রমে। এই যদি স্থিরচিত্রের পরিণতি হয়, তাহলে যে-ছবি কথাও বলে, তার কী দশা হবে, সেটা সহজেই অনুমেয়।

যদিও আমরা অনেকেই সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে বলে থাকি. বা শুনি অবশ্যই যে, বর্তমান সময়ের শিশু শিক্ষার্থীরাও অডিও-ভিজুয়াল নানা উপকরণের মাধ্যমে জীবনকে বুঝতে ও তাদের মতো করে মূল্যায়ন করতে সক্ষম। প্রশ্ন হচ্ছে— শিক্ষক (এখানে 'শিক্ষিকা' অর্থেও) কীভাবে শিক্ষার্থীদের দেখতে শেখাবেন, সাহায্য করবেন— যাতে সেই শিক্ষার্থীরা বড় হয়ে একদিন বিশ্লেষক বা 'critical thinker' হতে পারে? কারণ, জনপ্রিয় সংস্কৃতির সমালোচনামূলক মূল্যায়নের মাধ্যমে (সিনেমা এবং অন্যান্য মিডিয়া) একজন শিক্ষার্থী অনুভব করবে কীভাবে জনপ্রিয় সংস্কৃতির রাজনীতি আকাঙক্ষাকে সংগঠিত করে, কল্পনাকে উদ্দীপিত করে এবং শনাক্তকরণের আকার তৈরি করে।

একজন শিক্ষককে বুঝতে হবে যে, প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীই তার নিজস্বতা অনুযায়ী ভিন্নভাবে চলচ্চিত্রকে আবেগগত এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ব্যাখ্যা করে, তার প্রতিক্রিয়া জানায়। সিনেমার যে-চিত্রময়তা, তার সঙ্গে যোগস্থাপনের প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীকে শিক্ষক সাহায্য করতে পারেন, তিনি কিছুটা বাতলে দিতে পারেন কীভাবে চিত্র সাজিয়ে-সাজিয়ে

## ক্ষাথাদের মনে াসনেমার প্রভাব

অর্থের জন্ম হয়। কিংবা, সিনেমার ভিতরের সংকেতগুলিকে শনাক্ত করার প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে চিত্রের বাইরে প্রকাশিত অর্থকে অনুধাবন করা যায়। এই মেন্টরিংয়ের মাধ্যমে সিনেমাকে কেবলমাত্র বিনোদনের খেলনা হিসাবে না-ভেবে তাকে একটি ঐতিহাসিক অথবা সামাজিক দলিল হিসাবে ভাবানো যেতে পারে এবং অবশ্যই একটি সাংস্কৃতিক নিদর্শন হিসাবেও।

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষাদান— এই বিষয়টি বহুল প্রচলিত না হলেও একবারে অশ্রুতপূর্বও নয়। 'এলএক্সএল আইডিয়াজ'-এর মতো মৃষ্টিমেয় কিছু সংস্থা একদম শিশু থেকে কিশোর শিক্ষার্থীদের সহিষ্ণুতা, বন্ধুত্ব, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি জীবন-বিষয়ক মূল্যবোধের উপর নানাবিধ শর্টফিল্ম তৈরি করে। একই বিষয়ের উপর বাবা-মা এবং স্কুলের শিক্ষকদের জন্যও থাকে ভিন্ন-ভিন্ন ছোট ছবি, যাদের মাধ্যমে বড়রা চেম্টা করবে ছোটদের মনের কথা জানতে, বুঝতে। মূল উদ্দেশ্য— দুই প্রজন্মের মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন। আমরা, যারা বয়সে বড়, তারা হামেশাই যে-ভূলটা করে থাকি তা হল, নিজেদের কিশোর বয়সের সঙ্গে তুলনা করে ঠিক-ভূলের বিচার করতে যাওয়া। এই অতীতচারী মানসিকতাই প্রজন্মগত ব্যবধানকে আরও ব্যাপক করে তোলে।

মাঝে কোভিডের জন্য এক বছর বাদ থাকলেও ২০১৬ থেকে কলকাতার গার্ডেন হাই স্কুলে শুরু হয় এক ফিল্ম ক্লাব, স্কুলের আট থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়য়াদের জন্য। সেই অভিজ্ঞতায় দেখেছি— বয়ঃসন্ধির কিশোর-কিশোরীদের বিধিনিষেধের ঘেরাটোপের বাইরে নিজেদের প্রকাশ করার সুযোগ দিলে আখেরে লাভই হয়। যে

স্বতঃপ্রণোদিত সাহস তাদের থাকে. তাতে তারা অক্লেশে বার্গম্যান বা তারকোভস্কির ছবিকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। যদ্ধ থাকলেও সেটা দেখানো হয় না, তাই উত্তেজনা নেই— এই অজুহাতে "ইভান'স চাইল্ডহুড" তাদের কারও কারও ভাল লাগে না। কিন্তু সেটাই

যুদ্ধের উপর ভিত্তি করে জীবনের প্রতিচ্ছবি তারা এবপবেও দেখে কখনও 'বাইসাইকেল থিভস'-এ বা কখনও 'দ্য বয় ইন স্ট্রাইপড পাজামাস'-এ। বিষয়ভিত্তিক ছবির কিউরেশনের উদ্দেশ্যই হল— প্রতিতুলনা— যা তাদের মনে প্রশ্নের উদ্রেক করবে, ভাল লাগা বা মন্দ লাগার উধ্বের্ব উঠে। এসে পড়ে দ্বিতীয় (এবং প্রথম) বিশ্বযুদ্ধ, ইউরোপের অর্থনৈতিক মন্দা, ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলও আলোচনায় ঢুকে পড়ে চোরাস্রোতে। 'জোজো র্যাবিট'-এর জোজো, "ইভান'স চাইল্ডহুড"-এর ইভানের সঙ্গে সঙ্গে মৃণাল সেনের 'খারিজ'-এর পালান-কেও চেনার চেষ্টা করে এই পড়য়ারা। চারের দশকের রাশিয়া বা জার্মানির সঙ্গে তার চার দশক পর কলকাতার সাদৃশ্য/তারতম্যের অনুসন্ধানে নিজেদের অজান্তেই তারা দুই দেশ/উপমহাদেশের, দুই সময়ের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর তফাতেরও পাঠ নেয়।

এখনকার 'সিজিআই'-সর্বস্ব বিনোদনের দুনিয়ায় যেসব ছবি ফিল্ম ক্লাবে দেখানো হয়, অনেক ক্ষেত্রে সাদা-কালোও ('সাদা কালো তো অবাস্তব'), তা স্বভাবতই তাদের অনেকের কাছে প্রথম পছন্দ নয়। কিন্তু ফিল্ম ক্লাবের সদস্যরা জানে যে, অন্য দেশের, অন্য কালের ছবি দেখে আলোচনার জন্যই এখানে যোগ দেওয়া, যে-ছবি যে

কোনও সিনেমা হলেই দেখতে পাওয়া যায়, তা সচরাচর এখানে দেখা যাবে না। বিভিন্ন দেশের ছবি দেখার চর্চার মধ্য দিয়ে যে–চোখ তৈরি হয়, সেই বোধেই ছবির রংহীনতা আর কোনও অন্তরায় হয় না। সংলাপহীনতাও কোনও প্রতিবন্ধক হয় না বলেই চার্লি চ্যাপলিনের ভবঘুরের বিপ্রতীপে বাস্টার কিটনের প্রস্তরমুখকে তারা অনুধাবন করে স্ব-স্ব বোধে

এখনকার দিনের শিশু-কিশোরেরা তাদের মা-বাবার তুলনায় প্রযুক্তির বিষয়ে অনেক ওয়াকিবহাল, তার ব্যবহারে কৌশলী এবং সামাজিক পরিবর্তনের কারণে মতপ্রকাশে অনেক বেশি সাহসীও। তাই 'এই ছবিটা দেখো, কারণ এটা ক্লাসিক'— এহেন যক্তি এদের ক্ষেত্রে খাটবে না। কিন্তু প্রশ্ন: যেহেতু সংযোগের, তাই বড়দেরই এগিয়ে আসতে হবে দুই পা, নিচু হয়ে ছোটদের মনোজগতে কান পেতে বোঝার চেষ্টা করতে হবে তাদেরকেই, তাদের নিয়মেই। হয়তো তাহলে, ভয় থেকে না, বিশ্বাস করে আমাদের ভরসা করতে পারবে ছোটরা।

আমাদের ফিল্ম ক্লাবের কোনও কোনও কিশোর প্রায় বলে, "এই ছবিতে 'অ্যাভেঞ্জার' সিরিজের মতো অ্যাকশন নেই, পুরোনো ছবি বলে টেকনোলজি নেই।" যা টেকনোলজি-নির্ভর তাই-ই কেবল ভাল, যা মন্থর এই পৃথিবীতে তার কোনও সম্ভ্রান্ত জায়গা নেই— এই মতবাদে কেবলমাত্র কিশোরদের দায়ী করব কেন, যখন কম-বেশি প্রত্যেকেই আমরা এই ভাবধারাকে মেনে নিতে ক্রমশ যেন বাধ্য হচ্ছি। আমাদের আলোচনায় আমরা চেষ্টা করে যাই এই ধারণাকে খণ্ডন করতে। 'অ্যাভেঞ্জার' সিরিজেরও সব ছবি সমান গ্রহণীয় হয় না কেন, কম-বেশি টেকনোলজি এক হওয়া সত্ত্বেও, এটা সদস্যরা তখন ভাবতে শুরু করে। আর তখন যদি তাদের হিচককের 'বার্ডস' বা অড্রে হেপবার্ন অভিনীত 'ওয়েট আনটিল ডার্ক' ছবিকে মনে করানো হয়, তখন সদস্যরাই স্বীকার করে যে পুরনো ছবি হয়েও এই দু'টি ছবি থ্রিলার হিসাবে কী

এখনকার নতুন প্রজন্মকে যে-চারটি দক্ষতায় বিশেষ দড় হতে হবে, সংক্ষেপে ইংরেজিতে "Four C's"— 'Critical thinking', 'Creativity', 'Collaboration' 'S 'Communication'. বাংলায় চারটি 'স'— 'সমালোচনা', সৃষ্টিশীলতা', 'সহযোগিতা' এবং 'সংযোগ'। পৃথিবীর সিনেমাতিহাসের তাবড় তাবড় ছবি দেখিয়ে, আলোচনা করে তাদের নিত্যদিনের দেখা সিনেমার সঙ্গে তুল্যমূল্য আলাপ করার পরিসর তৈরি করতে পারলে— ওই চারটে দক্ষতাও অর্জিত হবেই।

লেখক একটি স্কুলের প্ল্যানিং অ্যান্ড সিস্টেমস ডিরেক্টর amitava.nag@gmail.com

(মতামত নিজস্প)



#### রাতভর নাটক

বছরের শেষ রাত সরগরম হয়ে উঠল নাট্যের সমস্বরে। 'ইচ্ছেমতো'-র বার্ষিক জাতীয় নাট্যোৎসব, পঞ্চম 'ইচ্ছেমতো পার্বণ' ৩১ জানুয়ারি সারারাত অনুষ্ঠিত হল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ। এই উৎসবের উদ্বোধনী পার্বণে উপস্থিত ছিলেন এম. কে. রায়না, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল রায়চৌধুরী। দিল্লির 'থ্রি আর্টস ক্লাব'-এর প্রযোজনা, ললিত সেহগালের নির্দেশনা 'হত্যা এক আকার কি' যেমন অভিনীত হল এই নাট্যোৎসবে, তেমনই ছিল 'সংসৃতি'-র 'রাবণের চুমু', গৌতম হালদার অভিনীত এই নাটকের নির্দেশনায় দেবেশ চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও 'নান্দীকার'-এর 'যত্নে রেখো', নির্দেশনায় সপ্তর্ষি মৌলিক গৌতম হালদারের অভিনয় ও নির্দেশনায় 'নয়ে নাটুয়া'-র 'কাব্যে গানে' এবং 'ইচ্ছেমতো'-র 'স্টোন ৩' মঞ্চস্থ হল এই নাট্যোৎসবে।



#### সব ছোটদের জন্য

পড়াশোনার পাশাপাশি গান, নৃত্য, আঁকা, আবৃত্তি প্রভৃতি সুকুমার-বৃত্তি ছোটদের মানসিক গঠনে যে সহায়ক, তা যতটা জানা, শিশুদের চিন্তনে প্রবিষ্ট করানোর ততখানি প্রয়াস বর্তমান অভিভাবক শ্রেণির মধ্যে কমে আসছে। তারই মধ্যে মফস্সল অঞ্চলে সংগ্রাম জারি রেখেছে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান। তেমনই অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান 'হিন্দোল সংগীত কলাকেন্দ্র'। তার নবম বার্ষিক বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হতে চলেছে ৫ জানুয়ারি, হাওড়ার শরৎ সদন প্রেক্ষাগৃহে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পণ্ডিত কৌশিক ভট্টাচার্য, দূরদর্শন ও আকাশবাণীর ঘোষক দেবাশীষ বসু এবং অভিনেত্রী কস্তুরী চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সংস্থার ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন আঙ্গিকের মেলবন্ধনে একক ও যৌথ পরিবেশন থাকবে। পরিবেশিত হবে আবৃত্তি, গীটার বাদন, সৃজনশীল নৃত্য এবং তবলা লহরা।



ছবি প্রতীকী